অনুবাদ।

তারিখ ২৩/৯/৮১ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

188

অনন্যপ্রতিভা

আলোকময় নাহা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রবীন্দ্র সাহিত্য গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিল্প-সাহিত্য আলোচক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ৭৮ বছর বয়সে গত ৩০শে আগষ্ট তাঁর কলকাতার বাসভবনে লোকান্তরিত হয়েছেন।

ময়মনসিংহ জেলার ইটনা থানার ঐতিহ্যবাহী হোম রায় পরিবারে ডঃ নীহার রায়ের জন্ম অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ইটনা থানার তিনজন প্রতিথযশা ব্যক্তি লোকান্তরিত হলেন। প্রথমে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস, অতি সম্প্রতি ভারতের প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা ভূপেশ গুপ্ত, আর এরপর ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

নীহার রঞ্জন রায়ের পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র হোম রায় ছিলেন স্কুল ইনসপেক্টর। স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দেন। পরে তিনি সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে এবং ময়মনসিংহ শহরে জাতীয় বিদ্যালয়ে (সিটি কলেজিয়েট স্কুলে) যোগ দেন। নীহার রঞ্জন এবিদ্যালয়েই শৈশবের পাঠ সমাপন করেন। পিতার কাছ থেকেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন।

ময়মনসিংহে ১৯০৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী নীহার রায়ের জন্ম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। আনন্দমোহন কলেজে ছাত্র থাকাবস্থায় নীহার রঞ্জন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেবার পর এই সময়ে বিপ্লবী সংস্থার সক্রিয় সভ্য থাকার কারণে তিনি ময়মনসিংহ জেলা থেকে বহিস্কৃত হন। সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে বি,এ, পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯২৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকর্ড মার্ক পেয়ে প্রাচীন ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯২৭ সালে রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগ দেন। ১৯২৯ সালে প্রেম চাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজের জবানীতে জানা যায় যে, ১৪ বছর বয়সে কিশোরগঞ্জের বই কৃতী সন্তান বিপ্লবী নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেখান থেকে তিনি সরে আসলেও আজীবন ওঁদের সাথে একটা বন্ধুত্ব বজায় ছিল। অনুশীলন সমিতিতে থাকা কালে বাংলাদেশের গ্রামের সাথে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে সব সময়ই বলতেন যে, বাঙালীর ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হতো না যদি না তাঁর বাংলার গ্রামের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকতো। ১৯২৬ সালে রাজনীতির সাথে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতি সেবায় নিয়োজিত হন। তিনি প্রথম যুগে সাংবাদিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ফরোয়ার্ড ও নেশন পত্রিকার সাথে তখন তিনি যুক্ত ছিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের লিবার্টি-পত্রিকার সাহিত্য-সচিব থাকাকালে তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে তার জীবনে আবার রাজনীতির প্রচ্ছায়া পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় থাকার দরুন ১৯৪৩ সালে বছরাধিক কাল তিনি রাজবন্দী হিসেবে কারাবাস ...ন। এ বছরের গোড়ায় ...নি পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট ...শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ...আন্দোলনে নেতৃত্ব ...ত বাসও ... ...ার

৯০০ অব্দের উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস স্বর্ণপদক পান। এ সময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপনা এবং ক্যালকাটা রিভিউ-এর কার্যকরী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি লণ্ডনে যান। সেখানে বৃটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে রয়েল সোসাইটি অব আর্টসের ফেলো নির্বাচিত হন। এরপর হল্যাণ্ডে যান এবং সেখানকার লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ও ডি-ফিল উপাধি প্রাপ্তির পর ১৯৩৬ সালে দেশে ফিরে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ান হিসেবে কর্ণভার গ্রহণ করেন। এ সময় থেকে তাঁর রচিত বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকলে তিনি বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বিশ্বভারতী পরিচালকমণ্ডলীতে মনোনীত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ইতিহাস বিভাগে ১৯৪৪ সালে তাকে 'বাগেশ্বরী রীডার' এবং এক বছর পর তাঁকে, 'বাগেশ্বরী অধ্যাপক' হিসেবে নিযুক্ত করে। এ সম্মানজনক আসনে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থেকে ডঃ নীহার রায় একজন যোগ্য এবং সার্থক অধ্যাপকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি বহুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন কমিটি সিনেটসহ বিভিন্ন পদে যোগ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাঁচ বছর তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর রচনামুগ্ধ ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যান। ১৯৫৪ সালে এবং ইউনেস্কোর অনুরোধে তিনি দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতের কেরালা, বরোদা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৫৭-৬৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সিমলায় ইণ্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব এডভান্স স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে পাঁচ বছরকাল দায়িত্ব পালন করে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। ভারতীয় ইতিহাস পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। যখনই যে দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত ছিলেন সেখানেই তাঁর অসামান্য কর্মদক্ষতা ও পরিচালন ক্ষমতার ছাপ রাখতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এত দায়িত্বে থেকেও এবং বহু দেশবিদেশ পরিক্রমণ করেও তিনি সে সাথে নিয়মিতভাবে সাহিত্য চর্চা ও বিদ্যা সাধনা চালিয়ে গিয়েছেন। বেনারস ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭০ সালে তিনি সাহিত্য একাদামী পুরস্কার পান। এডভান্স ষ্টাডিজ থেকে ১৯৭০ সালে অবসর গ্রহণ করে পে-কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তিনি।

ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষাক্ষেত্র ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ডঃ নীহার রায় ১৯৪৩ সালে 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' লিখে যশস্বী হন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, ঋণী আমি সেই একজনের কাছে যিনি আমার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সকল সত্তায় জড়িত। সেই একজন, সেই ব্যক্তিপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। আমি যদি কিছু করে থাকি, সে তার সস্নেহ ছোয়ায়, তারই আশীর্বাদে।" রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর বহু আলোচনা হয়েছে, বহু হবে। কিন্তু এত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাঞ্জল, পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল বিদগ্ধ আলোচনার জন্য বাঙালী সব সময়ই তাকে স্মরণ করবে। তবে খ্যাতির শীর্ষে তিনি আরোহণ করেন 'বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' মহাগ্রন্থটি লিখে। ১৯৫০ সনে এটি প্রকাশিত হয়। এ বহুল আলোচিত গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান। মূলতঃ কারাবাসে থাকাকালীন সময়েই তিনি এটি রচনা করেন। ইচ্ছে থাকা সত্বেও এর দ্বিতীয় পর্ব তিনি লিখে যেতে পারেননি এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। এ ব্যতিক্রমধর্মী ইতিহাস গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রচলিত রাজা মহারাজার কাহিনী না লিখে তিনি এতে আর্থ-সামাজিক ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। সমাজের উচুবর্ণ রাজন্য বা ব্রাহ্মণ ছাড়াও এখানে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থান পেয়েছে দেশের খেটেখাওয়া মানুষ কামার কুমোর শ্রেষ্ঠি শিল্পী এমন কি ভূমিহীন কৃষক। তার ব্যাখ্যায় গুরুত্ব পেয়েছে খাদ্যোৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতি, ভূগোল জনতত্ত্ব ও শ্রেণী বিন্যাস। মার্ক্সীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে রচিত এ গ্রন্থ সাধারণ বাঙালীর ইতিহাস।

স্যানসক্রিট বুদ্ধিজম ইন বার্মা, আর্ট ইন বার্মা, এ্যান এ্যাপ্রোচ টু ইণ্ডিয়ান আর্ট, ইণ্ডিয়ান আর্ট, এ্যান আর্ট ই ইন লাইফ, শিখ গুরুজ এ্যাণ্ড শিখ সোসাইটি, আইডিয়া এণ্ড ইমেজেজ, মুঘল পেইন্টিংস, মৌর্য এণ্ড সুঙ্গ আর্ট, আইডিয়া এণ্ড ইমেজ ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট, মেটাল স্কাল্পচার অব বেঙ্গল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রচুর তথ্যবহুল পণ্ডিতপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা এবং কর্মক্ষমতা জীবন সায়েহ্নে ছিল অবিশ্বাস্য রকম। মৃত্যুশয্যায় গুরুতর বুকো নিউমুনিয়ার শয্যাশায়ী থেকেও মৃত্যুর মাত্র তিনদিন আগে তিনি ভারত ইতিহাস চর্চায় দেশের বিজ্ঞান যাদুঘর শীর্ষক একটি ১২০ পৃষ্ঠার বিস্তৃত তথ্যবহুল রিপোর্ট শেষ করেন।

এ বছর মে মাসে আনন্দ মেলা থেকে শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ডঃ নীহার রায়কে সম্মান ও সম্বর্ধনা জানানো হলে তার ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন, "'বাংলাদেশ ও বাঙালী দুহাত ভরে আমাকে পুরস্কার দিয়েছেন। নানারূপে নানাভাবে আমার জীবনকে তাঁরা ধন্য করেছেন। —খুব বেশী আমি লিখিনি, তুলনায় হয়তো-অনেকের চাইতে কম। কিন্তু যখনই আমি যা লিখেছি বাঙালী তা সাদরে গ্রহণ করেছেন, এ যে আমার কতবড় পুরস্কার তা আমিই জানি।" ব্যক্তিগত জীবনে অসম্ভব বিনয়ী ছিলেন বলে হয়তো এ কথায় তিনি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবী সত্যি সত্যি তার রচিত গ্রন্থাবলী যেগুলোর আপন মাহাত্ম্য চিরদিন সাদরে গ্রহণ করে এই অনন্য মানুষটিকে স্মরণ করবে।